কৃত্তিবাসী রামায়ণ : কাহিনি সংক্ষেপ

কৃত্তিবাস ওঝা বিরচিত শ্রীরাম পাঁচালী বা রামায়ণ বাঙালির প্রাণের সামগ্রী। বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ রচনা করলেও তিনি মোটেই বাল্মীকির রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। বাঙালির ঐতিহ্যে বহুকাল ধরে লালিত পাঁচালির আদর্শে তিনি তাঁর রামায়ণ রচনা করেছেন। যেহেতু কৃত্তিবাসী রামায়ণ মূল বাল্মীকি রামায়ণের অক্ষরিক অনুবাদ নয় তাই বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালীতে বর্ণিত কাহিনি ও চরিত্রের পার্থক্যও যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে ড.দেবেশ কুমার আচার্য তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি ও মধ্যযুগ) গ্রন্থে বলেছেন, " ...মূল কাহিনিকে তিনি পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে নতুন রূপে পরিবেশন করেছেন। শুধু বাল্মীকি রামায়ণ নয়, 'জৈমিনি ভারত', 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'দেবী ভাগবত', মার্কণ্ডেয় পুরাণ', 'পদ্মপুরাণ', প্রভৃতি বিখ্যাত মহাকাব্য, পুরাণ ও তত্ত্বগ্রন্থ সমূহ থেকে তিনি উপাদান গ্রহণ করেছেন।" [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি ও মধ্যযুগ), ড.দেবেশ কুমার আচার্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা , পৃ. -১০২]

বাল্মীকি রামায়ণের মতো কৃত্তিবাসী রামায়ণও সাতটি কান্ডে বিভক্ত। সেই কান্ডগুলি হ'ল–১. আদিকান্ড ২. অযোধ্যাকান্ড ৩. অরণ্যকান্ড ৪. কিস্কিন্ধ্যাকান্ড ৫.সুন্দরকান্ড ৬. লঙ্কাকান্ড ৭. উত্তরাকান্ড । আমরা এই সাতটি কান্ডের কাহিনি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

<u>আদিকাণ্ড</u> : সূর্যবংশের রাজ চক্রবর্তী দশরথ। তাঁর তিন মহিষী -- কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। রাজা দশরথ সন্তানহীন থাকার কারণে তার মনে আর দুঃখের শেষ ছিল না। এরই মধ্যে রাজা দশরথ একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে বধ করে বসলেন অন্ধমুনির পুত্রকে। অন্ধমুনি পুত্রশোকে কাতর হয়ে দশরথকে এই বলে অভিশাপ দিলেন যে, তার মতো রাজা দশরথেরও পুত্রশোকে মৃত্যু হবে। এই অভিশাপ রাজা দশরথের মনে খুশির সঞ্চার করল, তিনি বুঝতে পারলেন

এই অভিশাপের মধ্যেই লুকিয়ে আছে পুত্র হবার বর। এরপর রাজা দশরথ রাজ্যে ফিরে এসে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করালেন। সেই যজ্ঞকুন্ড থেকে যে চারু উত্থিত হল তা ভক্ষণ করলেন তিন রানী, এরপরেই কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত ও সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। এই চারজনই ছিলেন বিষ্ণুর অংশসম্ভূত। অত্যচারী রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করার জন্য বিষ্ণু মানবের রূপ ধারণ করে অবতার গ্রহণ করেন। আর অন্যদিকে লক্ষ্মীদেবী হিমালয়ে বিষ্ণুর তপস্যা করছিলেন, রাবণ কামে পিড়ীত হয়ে লক্ষ্মীদেবীকে ধরতে গেলে লক্ষ্মী রাবণকে অভিশাপ দিয়ে পাতালে প্রবেশ করলেন, মিথিলার রাজা জনক যজ্ঞ করার জন্য তাঁর যজ্ঞভূমি কর্ষণ করার সময় তাঁর লাঙলের ফলায় এক পরম রূপবতী শিশুকন্যাকে মৃত্তিকার অভ্যন্তর থেকে লাভ করলেন। তিনি এই কন্যাটির নাম রাখলেন সীতা, কারণ সংস্কৃতে লাঙলের কর্ষণরেখাকে সীতা বলা হয়। এদিকে এই চার রাজকুমার শস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করলেন। একদা ঋষি বিশ্বামিত্র দশরথের সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর আশ্রমে উপদ্রব সৃষ্টিকারী রাক্ষসদের বিনাশ করার জন্য দশরথের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন, তিনি এ কাজে নির্বাচন করেন রাম ও লক্ষ্মণকে। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গিয়ে রাম তাড়কাসহ অন্যান্য রাক্ষসদের বধ করলেন, তিনশত বৎসর ধরে পাষাণ হয়ে থাকা ঋষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যাকে উদ্ধার করলেন অতঃপর তিনি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যাত্রা করলেন মিথিলায় সেখানে তখন রাজা জনক তার বিবাহযোগ্যা কন্যা সীতার জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছেন। শিব রাজা দশরথকে একটা ধনুক দিয়েছিলেন, জনক পণ করেছিলেন যে ওই ধনুকে গুণ সংযোজন করতে পারবে তার সঙ্গেই সীতার বিবাহ দেবেন। রাম ওই ধনুকে গু ণ পরিয়ে তা ভঙ্গ করতে সমর্থ হলেন। রামের সঙ্গে সীতার বিবাহ হল, শুধু তাই নয় দশরথের অন্যান্য পুত্রদের সঙ্গে জনকের অন্যান্য কন্যা ও ভাগিনেয়িদের বিবাহ সম্পন্ন হল। অতঃপর নববিবাহিত দম্পতি চতুষ্টয় অযোধ্যা নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড : রামের বিবাহের কিছুকাল পরে রাজা দশরথ রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করতে চাইলেন, কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠানের পূর্বসন্ধ্যায় দাসী মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ীর মনে ভাবান্তর ঘটল। বহুকাল পূর্বে রাজা দশরথ রানী কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন এই সুযোগে কৈকেয়ী দশরথের কাছে সেই দুটি বর চেয়ে বসলেন। এক বরে রামের স্থলে ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে হবে আর অন্য বরে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠাতে হবে। বৃদ্ধ ও হতাশ রাজা নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষার দায়েই কৈকেয়ীকে তার প্রার্থিত বরদুটি প্রদান করতে সম্মত হলেন। রাম পিতার আজ্ঞা মেনে বনবাসে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণ তার সঙ্গী হলেন। রামের প্রস্থানের পর পুত্রশোকে কাতর হয়ে রাজা দশরথের মৃত্যু হল। অযোধ্যায় যখন এসব ঘটনা ঘটছিল তখন ভরত ছিলেন নন্দীগ্রামে তার মাতুলালয়ে , সব শুনে তিনি অযোধ্যায় ফিরে এলেন। মায়ের কুটিল চক্রান্তে পাওয়া রাজপদ তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যন করলেন। তারপর রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিতে ভরত বনে এলেন, রামকে রাজপদ গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। কিন্তু পিতার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারণ করে চোদ্দ বছর কাল উত্তীর্ণ হবার পূর্বে রাম আযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনে আসম্মত হলেন। তারপর চারভাই ফল্গুনদীর জলে পুনরায় পিতৃশ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করলেন, ভরত রামের কাছ থেকে তার খড়মদুটি চেয়ে নিলেন। অযোধ্যায় ফিরে সেই খড়মদুটিই সিংহাসনে স্থাপন করে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

অরণ্যকাণ্ড : বনবাসে এসে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন। গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটী বনে কুটির নির্মাণ করে করে সেখানেই তারা বসবাস করতে থাকেন। একদিন রাবণের ভগিনী সুর্পনখা সেই বনে ভ্রমণ করতে করতে রাম ও লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ পেলেন। সুর্পনখা সুন্দরী নারীর ছদ্মবেশে রা ম ও লক্ষ্মণকে প্রলুব্ধ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। তখন ক্রোধে অন্ধ হয়ে সীতাকে ভক্ষণ করতে গেলে লক্ষ্মণ খড়্গাঘাতে সুর্পনখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করলেন। সুর্পনখার আপর রাক্ষস ভ্রাতা খর ও দূষন সুর্পনখার উপর এই লাঞ্ছনার সংবাদ

পেয়ে সসৈন্যে রাম ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু রাম ও লক্ষ্মণ চৌদ্দ হাজার রাক্ষস সমেত খর ও দূষনকে পরাজিত ও নিহত করলেন। রাবণ সুর্পনখার কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়ে ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে সীতাকে অপহরণ করার পরিকল্পনা করলেন। তাঁকে এই কাজে সাহায্য করতে সম্মত হলেন মারীচ নামে এক মায়াবী রাক্ষস। মারীচ স্বর্ণমৃগের ছদ্মবেশ ধরে সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। হরিণটির রূপে মোহিত হয়ে সীতা রামের কাছে হরিণটি চেয়ে বসলেন। রাম হরিণটি ধরতে গেলে মায়াবী হরিণ রামকে গভীর বনে নিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে সীতা শুনতে পেলেন, রাম আর্ত চিৎকার করে লক্ষ্মণকে তার প্রাণ বাঁচাতে বলছেন। আসলে মায়াবী মারিচ রামের কণ্ঠ নকল করে এমন চিৎকার করছিল। ভীত সীতা রামকে বাঁচানোর জন্য লক্ষ্মণকে রামের সন্ধানে যেতে বললেন। রাম যে অপরাজেয় সে কথা লক্ষ্মণ সীতাকে বাবংবার বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু সীতা সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। অবশেষে কুটিরের চারিদিকে একটি গণ্ডি কেটে এবং সীতাকে সেই গণ্ডীর বাইরে যেতে নিষেধ করে লক্ষ্মণ রামের সন্ধানে গেলেন। রাবণ এই সুযোগে ঋষির ছদ্মবেশ ধরে সীতার কাছে এসে ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন। রাবণের ছলনা বুঝতে না পেরে সীতা গণ্ডীর বাইরে এসে তাঁকে ভিক্ষা দিতে গেলে দুষ্ট রাবণ সীতাকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিজ রথে তুলে নিয়ে লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। জটায়ু নামক একটি বৃহদাকার রামভক্ত পাখি সীতাকে রক্ষা করতে গিয়ে রাবণের হাতে গুরুতর জখম হলেন। রাবণ সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কার অশোকবনে একদল রাক্ষসীর তত্ত্বাবধানে নজরবন্দী করে রাখলেন। এদিকে রাম ও লক্ষ্মণ মৃত্যুপথযাত্রী জটায়ুর কাছে সীতাহরণ সংবাদ পেলেন এবং অবিলম্বে সীতাকে উদ্ধারের জন্য যাত্রা করলেন। যাত্রাপথে শ্রবণা নামে এক বৃদ্ধা তপস্বিনী তাঁদের সুগ্রীব ও হনুমানের সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দিলেন।

<u>কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড</u> : সীতা অনুসন্ধানে জন্য পর্বতশিখরে সঞ্চরণ করার সময় বানরবীর সুগ্রীব ও হনুমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল রাম-লক্ষ্মণের। সুগ্রীব কিস্কিন্ধ্যার

রাজা বালীর ভাই, সেও কিস্কিন্ধ্যার রাজপদপ্রার্থী। রাম অগ্নিসাক্ষী করে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করলেন। রাম বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে কিস্কিন্ধ্যার রাজা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। সুগ্রীব ও বালীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন, পূর্ব পরিকল্পনা মতো রাম বালীকে পিছন থেকে তীর ছুঁড়ে হত্যা করলেন। বালী রামকে প্রশ্ন করলেন রাম কেন তাকে অন্যায় ভাবে হত্যা করলো ? উত্তরে রাম জানালেন, সে অন্যায়ভাবে সুগ্রীবকে রাজ্যচ্যুত করে, সুগ্রীবের স্ত্রীকে নিজের রানী করেছে এই অধর্মের কারণেই তার মৃত্যু হলো। বালী তখন নিজের অন্যয় বুঝতে পারলেন এবং মহানুভব রামের হাতে মৃত্যুর জন্য রামকে ধন্যবাদ জানালেন। এরপর সুগ্রীব কিস্কিন্ধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। রামের সহায়তার বিনিময়ে সুগ্রীব চতুর্দিকে সীতার অনুসন্ধানের জন্য বানর দল পাঠালেন। উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বগামী দলগুলি সীতার কোন সংবাদ পেল না। অঙ্গদ ও হনুমানের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণগামী দলটি সম্পাতি নামক একজন বৃদ্ধ পক্ষীর কাছ থেকে সংবাদ পেলেন যে, রাবণ সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রেখেছে।

সুন্দরকাণ্ড : সুন্দরকাণ্ড রামায়ণের কেন্দ্রীয় অংশ। এই অংশে হনুমানের লঙ্কা অভিযানের বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। সম্পাতির কাছ থেকে সীতার লঙ্কায় অবস্থানের সংবাদ পেয়ে বানর সৈন্যদল সাগরলঙ্ঘনের উদযোগ করতে লাগল। গয়,গবাক্ষ, গরাই, জাম্বুবান প্রমুখ সাগরলঙ্ঘনে নিজেদের অসমার্থ্যের কথা জানালে হনুমান সাগরলঙ্ঘনের সিদ্ধান্ত নিলেন। হনুমান এক বিশাল শরীর ধারণ করে এক লাফে সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় এসে উপস্থিত হলেন। লঙ্কায় এসে নানা স্থানে অনুসন্ধানের পর অশোকবনে হনুমান সীতার সন্ধান পেলেন। হনুমান দেখল, রাবণ সীতাকে ভয় দেখিয়ে তাকে বিবাহ করতে বলছে, চেড়িগণও সীতাকে বারবার রাবণকে বিবাহ করতে বলছিল। হনুমান সীতাকে রামের আংটি ও বার্তা দিলেন সেই সঙ্গে তাঁর সঙ্গে রামের কাছে যেতে বললেন, সীতা কিন্তু হনুমানের এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, রাবণ দু' মাসের জন্য তাঁর

জীবনদান দিয়েছেন, এই দু'মাসের মধ্যে রাম যেন রাবণকে বধ করে তাকে উদ্ধার করেন। এরপর সীতা তাঁর মাথা থেকে দিব্যমণি খুলে হনুমানকে দিয়ে তাঁর দুঃখের কাহিনি রামকে জানাতে বললেন। সীতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হনুমান রাবণের লঙ্কায় ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালালেন, তালজঙ্ঘ, সিংহনাদ, জাম্বুমালী, শোণিতাক্ষ, অক্ষয়কুমার প্রমুখ রাক্ষসবীরদের সঙ্গে হনুমান যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত ও নিহত করলেন। তারপর ধরা দিয়ে রাবণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রাবণকে নানাভাবে অপমান করলেন, ক্রুদ্ধ রাবণ হনুমানের লেজে আগুন লাগিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। এরপর হনুমান নিজের লেজের আগুনে সমগ্র লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত করে সাগর পার হয়ে ফিরে এলেন তাঁর অপেক্ষমান দলের কাছে, তারা কিস্কিন্ধ্যায় গিয়ে রামকে সীতার খবর দিলেন। এরপর রাম সমুদ্রে সেতুবন্ধনের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং অসংখ্য বানর সৈন্যসহ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলেন। অন্যদিকে লঙ্কায় রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ রাবণকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য, রাবণ বিভীষণের কোনো পরামর্শ গ্রহণ তো করলেনই না বরং চরম অহংকারে বিভীষণকে নানান কুকথা বলে তাঁর বুকে পদাঘাত করলেন, অপমানিত বিভীষণ চারজন মন্ত্রীসহ রাবণের সঙ্গ ত্যাগ করে রামের কাছে আশ্রয় নিলেন। এদিকে নলের নেতৃত্বে সেতুবন্ধন সম্পন্ন করে রাম তার অসংখ্য বানর সৈন্যসহ সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কায় প্রবেশ করলেন।

লঙ্কাকাণ্ড : রামায়ণ গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও ঘটনাবহুল কান্ড হল লঙ্কাকান্ড। এই কান্ডে দেখি, রাম তাঁর বানর সৈন্যদের সঙ্গে লঙ্কায় এসে পৌঁছেছেন। রাবণ,রামের এই সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় প্রবেশের সংবাদে বিস্মিত ও চিন্তান্বিত হয়ে তাঁর দুই বিশ্বস্ত চর শুক ও সারণকে পাঠালেন রামের সৈন্যবাহিনীর যাবতীয় খুঁটিনাটি সংবাদ নিয়ে আসার জন্য। শুক ও সারণ রামের সৈন্যবাহিনী পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে রামের বানর সৈন্যদের কাছে ধরা পড়ে নানাভাবে নিগৃহীত হলেন, পরে রাম শুক ও সারণের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে

তাদের মুক্ত করে দিলেন। শুক ও সারণ রামের কাছ থেকে এই মধুর ব্যবহার পেয়ে খুব প্রীত হলেন ও রাবণের কাছে গিয়ে রামের সুখ্যাতি করে, রামের সৈন্যবাহিনীর মহাবীরদের শক্তি ও সামর্থ্যের কথা রাবণকে জানালেন। শুক ও সারণের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না করে রাবণ আরও পাঁচজন চরকে পাঠিয়েছেন রামের সৈন্যবাহিনীর খবর নিয়ে আসার জন্য এই চরেরাও রামের সেনাদের কাছে ধরা পড়ে যায়, পরে তারা রাবণের কাছে ফিরে এসে রামের সেনাবাহিনীর বিশালতার কথা রারণকে জানায়। এরপর রাবণ বিদ্যুৎজিহ্ব নামক একজন মায়াবী রাক্ষসকে দিয়ে রামের 'ধনুকমুণ্ড' নির্মাণ করিয়ে সীতাকে দেখায়। সীতা রামের ওই নকল মূর্তি দেখে রামকে মৃত ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়লে, সরমা সীতাকে জানান রাবণ বিদ্যুৎজিহ্ব নামক এক মায়াবী রাক্ষসকে দিয়ে রামের ঐ মূর্তি নির্মাণ করিয়েছেন তার রাম যুদ্ধক্ষেত্রেই আছেন এবং ভালো আছেন। এরপর অঙ্গদ রামের দূত হয়ে রাবণের রাজসভায় আসেন এবং রাবণকে নানাভাবে তিরস্কার করেন ও শেষে রাবণের বহুমূল্যবান মুকুট নিয়ে রামের সমীপে হাজির হন ও রামের দ্বারা প্রশংসিত হন। এরপর রামের বানরসেনার সঙ্গে ও রাবণের রাক্ষস সৈন্যদের সরাসরি যুদ্ধ শুরু হয়। বহু রাক্ষসসৈন্যর মৃত্যু হয়। এরপর যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন রাবণপুত্র মেঘনাদ তিনি এই যুদ্ধে চরম পরাক্রম দেখান ও মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করে রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে অবদ্ধ করে ফেলেন পরে নারায়ণের বাহন গরুড় এসে রাম-লক্ষ্মণকে এই নাগপাশের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। রাবণের অন্যান্য বীর সেনাদের মৃত্যু হলে রাবণ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন এবং মহা পরাক্রম দেখিয়ে তিনি অঙ্গদ, হনুমান, নীল ও লক্ষ্মণকে পরাজিত করেন তবে রামের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। রামের কাছে পরাজিত হয়ে রাবণ তার মধ্যম ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে জাগিয়ে (ব্রহ্মার বরে কুম্ভকর্ণ একটানা ছ'মাস ঘুমোতো ও একদিন জাগত) যুদ্ধে পাঠান। কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে গিয়ে বহু বানর সৈন্য ভক্ষণ করেন ও অসংখ্য বানরসেনা বধ করেন শেষে আবশ্য রামের হাতে তার মৃত্যু হয়। কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর একে

একে মৃত্যু হয় দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর, মহাপাশ প্রমুখ রাক্ষসবীরদের। এতগুলি রাক্ষসবীরের মৃত্যুর পর মেঘনাদ আবার যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন এবং এই যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখান। রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, সুগ্রীব প্রমুখ মহাবীরেরা সজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। জাম্বুবানের পরামর্শে হনুমান মহীধর পর্বত যুদ্ধক্ষেত্রে উত্থিত করে নিয়ে এলে, সেই পর্বত থেকে ওষুধ সংগ্রহ করে জাম্বুবান, রাম-লক্ষ্মণসহ অন্যান্য বানর সেনাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন। পুনরায় যুদ্ধ করতে এসে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ বিষবাণ প্রয়োগ করে রাম-লক্ষ্মণ-সুগ্রীব প্রমুখকে পরাজিত ও সজ্ঞাহীন করে দিলেন, হনুমান ও বিভীষণ তখন গরু ড়কে নিয়ে ইন্দ্রের কাছে গিয়ে আমৃত সংগ্রহ করে নিয়ে এলে সকলেই আবার পুনর্জীবন লাভ করলেন। ইন্দ্রজিৎ তৃতীয়বারের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন বিদ্যুৎজিহ্বকে দিয়ে মায়াসীতা নির্মাণ করিয়ে। তারপর সেই মায়াসীতা তিনি রামের সামনে বধ করলেন, রাম এই মায়াসীতাকে প্রকৃত সীতা ভেবে শোকে ভেঙে পড়লেন, তখন বিভীষণ রামকে জানালেন কীভাবে বিদ্যুৎজিহ্বকে দিয়ে মায়াসীতা নির্মাণ করিয়ে মেঘনাদ রামের সঙ্গে প্রতারনা করেছেন। এরপর বিভীষণ মেঘনাদের বিনাশের উপায় রাম-লক্ষ্মণকে জানালেন এবং রামের অনুমতি নিয়ে লক্ষ্মণ ও কিছু বানরসেনা নিয়ে বিভীষণ লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। যজ্ঞরত মেঘনাদের যজ্ঞভঙ্গ করে লক্ষ্মণ তাকে বধ করলেন । এরপর যুদ্ধে এলেন রাবণের পাতাল নিবাসী এক পুত্র -- মহীরাবণ। এই মহীরাবণ বিভীষণের ছদ্মবেশে রামের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে রাম-লক্ষ্মণকে হরণ করে পাতালপুরীতে নিয়ে গেলেন, শেষে হনুমান পাতালে প্রবেশ ক রে কৌশলে মহীরাবণ ও তার পুত্র অহিরাবণকে বধ করে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে লঙ্কায় ফিরে এলেন। মহীরাবণ ও অহিরাবণ বধের পর রাবণ পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন, ক্রুদ্ধ রাবণ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে শক্তিশেল নিক্ষেপ করলেন, শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। লক্ষ্মণকে বাঁচানোর জন্য বৈদ্য সুষেণের পরামর্শে হনুমান বিশল্যকরণী আনার জন্য গন্ধমাদন পর্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এদিকে

সূর্য একবার উদিত হলে ওই বিশল্যকরণীর আর কোনো ওষধি গুন থাকবে না জেনে রাবণ সূর্যকে আদেশ দিলেন রাত্রি দু'প্রহরে উদিত হতে, রাবণের নির্দেশে সূর্য যখন অসময়ে উদিত হতে চলেছে তখন হনুমান সেই উদীয়মান সূর্যকে কক্ষতলে বন্দী করে গন্ধমাদন পর্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। গন্ধমাদন পর্বতে পৌঁছে হনুমান গন্ধকালী আপ্সরাকে উদ্ধার করলেন, রাবণের পঠানো রাক্ষস কালনেমিকে বধ করে গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করলেন, পথিমধ্যে রামভ্রাতা ভরতের সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ হল। গন্ধমাদন পর্বত থেকে প্রাপ্ত বিশল্যকরণীর সাহায্য লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করলেন। এরপর রাম-রাবণের ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হল, রামচন্দ্র রাবণের মাথা কাটলেন কিন্তু ব্রহ্মার বরে সে মাধা আবার জোড়া লেগে গেল, এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলতে লাগল। রাম হতাশ হয়ে পড়লেন এ সময় ব্রহ্মা রামের কাছে এসে অকালবোধন করে দেবী মহামায়ার পূজা করতে বললেন, রাম অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে দেবী দুর্গার পূজা সম্পন্ন করলেন। এদিকে বিভীষণের কাছ থেকে রাবণের মৃত্যুবাণ সম্পর্কিত খবর জেনে হনুমান লঙ্কায় বৃদ্ধ পণ্ডিতের ছদ্মবেশে প্রবেশ করে মন্দোদরীর কাছ থেকে চালাকি করে সে বাণ সংগ্রহ করে রামের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, রাম সেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে রাবণকে হত্যা করলেন। সমগ্র লঙ্কা শোকের সাগরে নিমজ্জিত হল। এরপর রাম সিদ্ধান্ত নিলেন যেহুতু সীতা দীর্ঘ দশমাস রাবণের গৃহে ছিল তাই তিনি সীতাকে ত্যাগ করবেন। একথা শুনে মনোদুঃখে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করলেন, কিন্তু অগ্নিদেবতা সীতা প্রকৃতই সতী বলে তাকে গ্রহণ করলেন না, ফিরিয়ে দিলেন রামচন্দ্রের কাছে। এতদিনে রাম-সীতার মিলন হল। এরপর রাম পুস্পক রথে চড়ে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে ভরদ্বাজ মুনির সঙ্গে রামের সাক্ষাৎ করলেন, সাক্ষাৎ হল মিতা গুহকের সঙ্গেও। এরপর রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও অন্যান্য পরিজনসহ অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন। পরেরদিন রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হল।

উত্তরকাণ্ড : উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে রাম, সীতা ও রামের অন্যান্য ভ্রাতাদের শেষজীবন। রাম রাজা হবার পর সীতাকে নিয়ে বেশ কিছুদিন সুখে সংসার করেন। এদিকে অগ্নি দ্বারা সীতা পরিক্ষীত হওয়া সত্ত্বেও সীতাকে নিয়ে অযোধ্যার প্রজারা নানান কুকথা বলতে থাকে, ছড়াতে থাকে নানান গুজব। এইসব ঘটনায় বিচলিত হয়ে রাম সীতাকে বনবাসে পাঠান। সন্তানসম্ভবা সীতা আশ্রয় নেন ঋষি বাল্মিকীর আশ্রমে। সেখানেই তাঁর যমজ পুত্রসন্তান লব ও কুশের জন্ম হয়। ঋষি বাল্মিকী লব ও কুশকে রামায়ণ গান শিক্ষা দেন। ইতোমধ্যে রাম অশ্বমেধ ঝজ্ঞের আয়োজন করলে বাল্মিকী লব ও কুশকে নিয়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন। লব ও কুশ রামচন্দ্রের ওই সভায় সকলকে রামায়ণ গান গেয়ে শোনান। রাম সীতার বনবাসের গান শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হন। তখন বাল্মিকী সীতাকে রামের কাছে নিয়ে আসেন। রাম সীতাকে সকলের সামনে পুনরায় অগ্নিপরীক্ষা দিতে বললে অপমানিত সীতা মাতা ধরিত্রীকে আহ্বান জানান। মাটি বিদীর্ণ হয়। দেবী ধরিত্রী পাতাল থেকে উঠে এসে সীতাকে নিয়ে পাতালে চলে যান। এরপর রাম তাদের চার ভাইয়ের আট পুত্রকে বিভিন্ন রাজ্যের রাজা করলেন, লব ও কুশ পেল অযোধ্যা ও নন্দীগ্রাম। এরপর রাম সরযূ নদীতে আত্মবিসর্জন করে বৈকুণ্ঠে ফিরে আসলেন। বৈকুণ্ঠে এসে রাম বিষ্ণুমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন, বৈকুণ্ঠে রাম,লক্ষ্মণ,ভরত ও শত্রুঘ্নর চারটি শরীর একটি শরীরে রূপান্তরিত হল।

এইভাবেই কবি কৃত্তিবাস বাল্মিকীর মূল সংস্কৃত রামায়ণটিকে অত্যন্ত সহজভাবে, পাঁচালীর আঙ্গিকে লোকসাধারণের উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন। আর সে কারণেই এ কাব্য বাল্মিকী রামায়ণের সেই চিরন্তন ভাবগাম্ভীর্য ত্যাগ করে, একান্তভাবেই হয়ে উঠেছে বাঙালির প্রাণের সামগ্রী, আত্মার আত্মীয়।